‘‘উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তন : সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণ’’

সংক্ষিপ্তসার

উত্তরবঙ্গ নামে নির্দিষ্ট কোন ভূখণ্ড পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতবর্ষের মানচিত্রে না থাকলেও গঙ্গার পূর্ববর্তী সাতটি জেলা (জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দার্জিলিং, মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং আলিপুরদুয়ার) উত্তরবঙ্গ নামে সমধিক পরিচিত। এই উত্তরবঙ্গ নামটি বর্তমানে সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শুধু যুক্ত নয় প্রশাসনিকভাবেও জুড়ে আছে। যদিও স্বাধীনোত্তর সময়ে উত্তরবঙ্গের সীমানা যথেষ্টই সংকুচিত হয়েছে দেশভাগ, কাঁটাতারের বেড়াজালে। এই উত্তরবঙ্গে অর্থাৎ তরাই ডুয়ার্স অঞ্চলটি নৃতত্ত্বের জাদুঘর হিসাবেও আখ্যায়িত। আত্রেয়ী-পুনর্ভবা-মহানন্দা-বালাসন-তিস্তা-রায়ডাক-সংকোশ বিধৌত এই সাংস্কৃতিক বলয়ে ভারতের প্রধান চারটি ভাষা বংশের (ভারতীয় আর্য, দ্রাবিড়, অস্ট্রিক এবং ভোট-চীনীয়/ভোট বর্মী) মানুষই বসবাস করে। এই অঞ্চলটিকে মিনি ভারতবর্ষের প্রতীক হিসাবেও ধরে নেওয়া হয়। উত্তরবঙ্গ এমন একটি অঞ্চল যার জলপথ এবং স্থলপথ দিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জীবন ও জীবিকার টানে বহু জনজাতি-জাতির আগমন ঘটেছে। তারা কখনও স্থায়ী হয়েছে আবার কখনও চলে গেছে অন্যত্র। এই পরিযায়ী সমাজের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব এখানকার ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনচর্যায় প্রভাব বিস্তার করেছে। বিচিত্র ভাষা ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে উত্তরবঙ্গের একটা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য এবং সম্ভাবনা তাই সবসময় বিদ্যমান।

উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী বহু জনজাতির অন্যতম একটি জনগোষ্ঠী হল রাজবংশী জনসমাজ। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারির পরিসংখ্যানে জানা যায় যে মোট রাজবংশী জনসংখ্যার ৭৭.১৯ শতাংশ এই উত্তরবঙ্গেই বসবাস করে। সুপ্রাচীন ঐতিহ্য, পরম্পরা ও লোকায়ত ভুবনের অধিকারী এই কৌম জনগোষ্ঠী প্রাক্-ঐতিহাসিক কাল ধরে এখানে বসবাস করে। প্রাচীনকাল থেকে এই অঞ্চলে সাংস্কৃতিক বিমিশ্রণের ধারাটি সক্রিয়। কালের নিয়মে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সমাজ সংস্কৃতি বিবর্তিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। রাজবংশী সমাজও এই রূপান্তর, বিবর্তন প্রক্রিয়ার বাইরে

থাকেনি। কোচ-রাজবংশ ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব তো ছিলই। ধারাবাহিকভাবে কৌম সমাজ থেকে জীবনচর্যায় আর্যীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে মনীষী পঞ্চানন বর্মার নেতৃত্বে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় 'ক্ষত্রিয়' পরিচয়ের অধিকারী হয়। মাতৃতান্ত্রিক পরিচয় তথা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বলয়টি ক্রমশ শিথিল হয়ে সামগ্রিকভাবে পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি অব্যাহত। দ্রুত এক সাংস্কৃতিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাজবংশী সমাজ আজকের সময়ে উপনীত হয়। আর্থসামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজ, জীবনচর্যা, পেশা বৃত্তি, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস সহ মনন দর্শনও পরিবর্তিত হয়, বদলে যায় সাংস্কৃতিক বলয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে বিগত পাঁচ-ছয় দশকে এই পরিবর্তন বিশেষ করে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ত্বরান্বিত হয়েছে। এই বিবর্তমান সাংস্কৃতিক বলয়টিকে সময়কালের নিরিখে তুলে ধরার প্রয়াসই গবেষণার বিষয়। সেই উদ্দেশে গবেষণার বিষয় সূচিত হয়েছে ''উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তন : সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণ।'' প্রকল্পটির মধ্যে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর কয়েকশ' বছরের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারাবাহিক পর্বগুলি সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণে তুলে ধরা হয়েছে।

সংস্কৃতি সমষ্টিগত জীবনের সামগ্রিক রূপ। আবার সমাজ বলতে একটা জনসমষ্টিকে বোঝায়। অর্থাৎ নির্দিষ্ট জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত একটি সংগঠিত ও সংযোজিত সমাহার হল সমাজ। সমাজের একটি সাংগঠনিক রূপ থাকে। সমাজের সঙ্গে সংস্কৃতি সম্পৃক্ত একটি বিষয়। নৃতত্ত্ববিদ ই বি টাইলর তাঁর 'প্রিমিটিভ কালচার' গ্রন্থে সংস্কৃতি সম্পর্কে বলেছেন 'Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, customs and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society.' সংস্কৃতি সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয় তাই সতত: পরিবর্তনশীল। সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে দ্বন্দ্ব অনিবার্য এবং আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয় সময়কাল প্রেক্ষিতকে ভিত্তি করে। মানুষের সৃষ্টির সামগ্রিক রূপই হল সংস্কৃতি। আবার সামাজিক পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন কারণ থাকলেও অর্থনৈতিক কারণটি মুখ্য। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে জীবন, ধর্ম, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি পরিবর্তিত হয়। রাজনৈতিক আধিপত্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এমনকী ভূ-প্রাকৃতিক পরিবর্তনও বিবর্তনের কারণ।

রাজবংশী জনগোষ্ঠী সুদীর্ঘ সময়কালে সুদৃঢ় হয় অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। বিবর্তনের ধারায় প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়ে পরম্পরাগত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অধিকারী হয়েছে। জীবনচর্যায় যেমন কৌম চিহ্ন বহন করে তেমনি লোকায়ত সমাজ সংস্কৃতির মধ্যে ভূ-সাংস্কৃতিক এবং নৃ-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যও ধরে রেখেছে। কিন্তু আর্থসামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের সাথে সাথে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির পরিসরটি দ্রুত বিবর্তমান হয়। বিশেষ করে বিগত পাঁচ-ছয় দশকে এই বিবর্তন ত্বরান্বিত হয়েছে। বিভিন্ন সংকটে আবর্তিত হয়ে এই জনগোষ্ঠী আজকে বিবিধ প্রশ্নেরও সম্মুখীন। তার প্রেক্ষিতে ক্ষোভ, বিক্ষোভ, আন্দোলনের ক্ষেত্র যেমন তৈরি হয় আত্ম সচেতনতারও বিকাশ ঘটে; সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে যা অনুধাবনযোগ্য। গবেষণা প্রকল্পে এই বিষয়টি পর্যায়ভিত্তিক বিভিন্ন পর্বে ধরা পড়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে রাজবংশী সমাজের নৃ-গোষ্ঠীগত পরিচয় প্রসঙ্গে বিভিন্ন গবেষক, নৃতত্ত্ববিদ, সমাজবিদ তথা ব্রিটিশ প্রশাসক, সর্বেক্ষকদের অনুসন্ধান ও প্রতিবেদন রিপোর্টকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। হ্যামিলটন বুকানন, মন্টোগোমারী মার্টিন, হজসন, ইউলিয়াম হান্টার, ডি এইচ ই সান্ডার্স এবং জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন-এর মত পণ্ডিতবর্গ এই জাতির নৃ-গোষ্ঠীগত পরিচয় নিয়ে বিভিন্ন মতামত দেন। পরবর্তীকালে আরো বেশ কিছু গবেষক, পণ্ডিত, বিদগ্ধজন এ বিষয়ে সবিশেষ আলোকপাত করেন। অনেকের মতে রাজবংশী জনগোষ্ঠী মঙ্গোলীয় নৃ-গোষ্ঠী শাখার বৃহত্তর বোডো গ্রুপের অন্তর্গত হয়েও দ্রাবিড়ীয় সংমিশ্রণ ঘটেছে। খ্রিস্টপূর্ব দশম শতাব্দীর কোন এক সময়ে ইন্দোমঙ্গোলীয় জনপ্রবাহ উত্তর পূর্ব ভারতে বিস্তার লাভ করে। তারপর ধীরে ধীরে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বসবাস শুরু করে। ছড়িয়ে পড়ে উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ (অধুনা বাংলাদেশ), উত্তর বিহার এবং হিমালয়ের সানুদেশ নেপাল অঞ্চলে। ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বখতিয়ার খিলজির (১২০৩ খ্রিস্টাব্দ) তিব্বত আক্রমণের সময় ও তিব্বতের মধ্যবর্তী ভূ-খণ্ড পর্বতময় ও জঙ্গাকীর্ণ ছিল। ঐ এলাকায় সে সময় ইন্দোমঙ্গোলীয় কোচ, মেচ, থারু জনজাতির বসবাস ছিল। চ্যাপ্টা নাক, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ চোয়াল, ছোট ছোট চোখ ও ভ্রু ইত্যাদির গড়ন দেখে এদেরকে তিনি বৃহত্তর বোডো পরিবারের সদস্য হিসাবে আখ্যায়িত করেন। এইসব বৃহত্তর বোডো গ্রুপের একাধিক শাখা অসম সহ উত্তরবঙ্গে পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করে এবং বিস্তৃত অংশ জুড়ে এক বিরাট রাষ্ট্র গড়ে তোলে। এদেরই একটি অংশ ষোড়শ শতাব্দীর

সূচনায় 'রাজবংশী' হিসাবে আখ্যায়িত হয় কোচ-রাজবংশের অভ্যুত্থানে। কোচ-মহারাজাদের আনুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রসার ঘটে এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ঘাত প্রতিঘাতে 'রাজবংশী' হিন্দু জাতির সংশ্লিষ্ট হয়।

পরবর্তীকালে কোচ ও রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভিন্নতা নিয়ে ব্রিটিশ আধিকারিকদের মধ্যে বিভ্রান্তির সূচনা হয়। রাজবংশীদের বৃহত্তর একটা অংশ দাবি করেন যে 'রাজবংশী' জনগোষ্ঠী একটি স্বতন্ত্র ক্ষত্রিয় জাতি এবং বঙ্গদেশে আর্যীকরণের (চতুর্থ-সপ্তম শতাব্দী) সময়পর্বেই তারা হিন্দু ধর্ম, ভাষা সংস্কৃতির অংশ হয়ে ওঠে। পরশুরামের ক্ষত্রিয় নিধনের ভয়ে তারা হিমালয় সন্নিকটবর্তী এলাকায় আত্মগোপন করে থাকার ফলে ভঙ্গ-ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। পুরাণ, শাস্ত্রাদির তথ্য সাপেক্ষে মনীষী পঞ্চানন বর্মার নেতৃত্বে 'রংপুর ক্ষত্রিয় সমিতি' আন্দোলনে মুখর হয়। ব্রিটিশ সরকার ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারির প্রতিবেদনে কোচ ও রাজবংশীদের পৃথক হিসাবে বর্গীকরণ এবং রাজবংশী জনগোষ্ঠীকে 'ক্ষত্রিয়' হিসাবে নথিভুক্ত করেন। রাজবংশী জনগোষ্ঠীর উদ্ভব ও স্বতন্ত্রতা নিয়ে বিদ্বজ্জন ও পণ্ডিতবর্গের মধ্যে এখনও কিছু বিতর্ক আছে। তবে রাজবংশী জনগোষ্ঠী এই 'ক্ষত্রিয়' পরিচয়ে সমাজ সংস্কারে যেমন ব্রতী হয় তেমনি জাতিসত্তার উন্মোচন, আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি ও হৃত গৌরব উদ্ধার এবং সমাজ সংস্কৃতির সামগ্রিক বিকাশে উদ্যোগী হয়। স্বাভাবিকভাবে জীবনচর্যার রীতিনীতি, হিন্দু ধর্মীয় সংস্কার বিধি, সংস্কৃতির সংমিশ্রণ, আত্তীকরণের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন সূচিত হয়। পাশাপাশি লোকায়ত সংস্কৃতির পরিচর্যার মধ্য দিয়ে নিজস্ব কৌম সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে পরম্পরা ও ঐতিহ্যে বহন করে স্বাতন্ত্র্যতা রক্ষার চেষ্টা করে। প্রথম অধ্যায়ে নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিষয়গুলিকে উত্থাপন করে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর উদ্ভব ও বিকাশ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে কোচ-রাজবংশের প্রেক্ষাপটে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির বিস্তার নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। কারণ কোচ-রাজবংশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে 'রাজবংশী' জনগোষ্ঠীর সূচনা এবং মহারাজাদের ধর্মীয় মনোভাব ও উদারতায় হিন্দুধর্মের অংশ হয়ে ওঠা, সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তন। লোকায়ত সংস্কৃতির বৃত্তটিকে অনুসরণ করার সাথে সাথে বর্ণহিন্দুদের সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হওয়ার প্রবণতার মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক বিবর্তনের বিষয়গুলি এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। ধর্মীয় মনোভাবে প্রকৃতিবাদ, বৌদ্ধিয়, শৈব, শাক্ত

থেকে শঙ্করপন্থী ‘একশরণ’ বৈষ্ণবীয় ভাবধারার সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনার সম্প্রসারণ ঘটে। পরিবর্তন ঘটে সমাজব্যবস্থা, খাদ্যাভ্যাস, সংস্কার, রীতি-আচার-বিচারের। কিন্তু তা সত্ত্বেও কৃষি নির্ভর রাজবংশী সমাজ নিজস্ব লোকায়ত বলয়টিকে লালন পালন করে কৌম ধর্ম এবং সমাজ ও সংস্কৃতিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়। কোচ-রাজবংশের অভ্যুত্থানে এবং তাদের ধর্মীয় ঔদার্যে সংমিশ্রণ, সংশ্লেষণ, আত্তীকরণ ইত্যাদি সাংস্কৃতিক বিনিময় প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে স্বতন্ত্রতা রেখেই রাজবংশী একটি শক্তিশালী জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়। বলা যায় বর্ণহিন্দু তথা বৃহত্তর হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতির অনেক কিছুকে গ্রহণ করেও নিজস্ব লোকায়ত ও ভূ-সাংস্কৃতিক বলয়টিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছে। এই অধ্যায়ে এই বিষয়গুলি পর্যায়ক্রমে উত্থাপিত হয়েছে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সময়ে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্বে (১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দ) কোচরাজ্য ব্রিটিশ সরকারের করদমিত্র রাজ্যে পরিণত হয়। ব্রিটিশ সরকার প্রথমেই কোচ রাজ্যের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। ফলে সামাজিক বিন্যাস, জোতদারি ব্যবস্থার সূচনা, চুকানীদার, দর চুকানীদার, আধিয়ার আন্তঃসম্পর্ক, রাজবংশী সমাজের খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, লোকাচার, পূজা-পার্বণ, রীতিনীতি এমনকী ধর্মীয় পরিসর ইত্যাদিরও পরিবর্তন শুরু হয়। পরবর্তীকালে এই পরিবর্তন ধীরে হলেও সময়কালের প্রেক্ষিতে ঘটতে থাকে। এতদঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। প্রশাসনিক ও ব্যবসা বাণিজ্যের কারণেও অনেকে এখানে এসে বসবাস শুরু করেন। বিভিন্ন প্রেক্ষিতে সমাজ সংস্কৃতির পরিবর্তনের বিষয়গুলি এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় মনীষী পঞ্চানন বর্মার নেতৃত্বে ‘ক্ষত্রিয় সমিতি’র আন্দোলন এবং তাঁর সমাজ সংস্কারের বিষয়গুলি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনার পরিসরে উঠে আসে। ধর্মীয় বিবর্তনের বিষয়টিও এ প্রসঙ্গে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়। সামগ্রিক ভাবে এই অধ্যায়ে ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ, কর্মকাণ্ড, তাদের বাণিজ্য বিস্তার সহ পঞ্চানন বর্মার ‘ক্ষত্রিয়করণ’ আন্দোলন, সমাজ সংস্কারের উদ্যোগ সহ রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতি বিবর্তনের বিষয়গুলি বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ স্বাধীনোত্তর সময়কালেই রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তন দ্রুত সম্পাদিত হয়। স্বাধীনতা, দেশভাগ এবং ধারাবাহিক অভিবাসনের ফলে উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাসের সঙ্গে সমাজ কাঠামোর ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। জোতদার শ্রেণির

অবসান, আধিয়ারদের সংকট, পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি, জীবন-জীবিকার প্রতিযোগিতা, কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষার প্রসার নানাবিধ কারণে রাজবংশী সমাজের সামগ্রিক পরিবর্তন ঘটে। বিশ্বায়নের প্রভাব, তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ইত্যাদি কারণেও এই পরিবর্তন ত্বরান্বিত হয়। ক্ষোভ, বিক্ষোভ, আন্দোলনও এই পর্বেই সংগঠিত হয়। এবম্বিধ কারণে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তন বিভিন্নভাবে পরিলক্ষিত হয়। বর্ণহিন্দুদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি, রাজবংশীদের একটা শ্রেণির মধ্যবিত্তে পরিণত হওয়া এবং সংস্কৃতি বিষয়ে উদাসীনতা, গ্রামে পৃষ্ঠপোষক কিংবা অবস্থাপন্ন পরিবারের সংখ্যা কমে যাওয়া এই পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে। রাজনৈতিক প্রভাবও একটি অন্যতম কারণ। আবার এই সময়কালেই রাজবংশী সমাজের একটি অংশ আত্মসচেতন হয়ে ওঠেন, তারা সংগঠিত হয়ে নিজস্ব সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য ধরে রাখার বিষয়ে উদ্যোগী হয়। এই সামগ্রিক বিষয়গুলি বিস্তারিত ভাবে এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। কারণ স্বাধীনোত্তর সময়কালের কয়েক দশকের ঘটনাবলী রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

'সাহিত্যে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি' শীর্ষক পঞ্চম অধ্যায়ে রাজবংশী সমাজের লোকসাহিত্যের বিস্তৃত উপাদানগুলি প্রসঙ্গে এসেছে। ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, ছিল্কা অর্থাৎ শ্লোক, কিচ্ছা বা লোককাহিনি ইত্যাদির সঙ্গে বিভিন্ন পর্ব ভিত্তিক, পূজা-পার্বণ কেন্দ্রিক গান, ব্রতকথা, লোকনাট্য সেইসঙ্গে ময়নামতীর গান-যুগীর গান-গোরখনাথের গান সহ রতিরাম দাসের 'জাগ গান-কানাই-ধামালী' মদনকামের গান, মনসা-বিষহরির মাড়েয়া গান, রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগীর 'গোসানীমঙ্গল' কাব্যে তৎকালীন সময়কালের রাজবংশী সমাজ জীবনের বহু ছবি পাওয়া যায়। প্রাসঙ্গিকতায় কোচবিহার রাজন্যপোষিত অনুবাদ সাহিত্যচর্চার বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে। জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন, ড. দীনেশ চন্দ্র সেন, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ সহ মনীষী পঞ্চানন বর্মার রাজবংশী ছড়া, গান, ছিল্কা, শ্লোক সংগ্রহ ও প্রকাশ করার বিষয়গুলির প্রতি সবিশেষ আলোকপাত করা হয়েছে। আবার বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উত্তরবঙ্গের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সূত্র ধরে রাজবংশী ভাষায় সাহিত্য সৃজনের একটি ধারার সূচনা হয়। দীর্ঘ আলোচনা তিনটি উপ-অধ্যায়ে (লোকসাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতি, বাংলা সাহিত্যে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি এবং রাজবংশী সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি) সন্নিবেশিত

হয়েছে। এই অধ্যায়ের বিষয় বিস্তারে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি এবং বিবর্তনের ধারাগুলিও চিহ্নিত হয়েছে সাহিত্য সৃজনের বর্ণ বিন্যাস এবং মনন ভাবনায়।

গবেষণা প্রকল্পটির মূল বিষয়টি আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে। এই অধ্যায়ে রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের বিভিন্ন ধারা প্রক্রিয়াগুলি কারণ সহ চারটি উপ-অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচিত হয়েছে। পূজা-পার্বণ ও আচার সংস্কার, লোকায়ত সংস্কৃতি, ধর্মীয় সংস্কৃতির পরিবর্তন সহ সাহিত্যে সাংস্কৃতিক বিবর্তনের বিভিন্ন পর্বগুলি সমাজ প্রক্রিয়ার ধারায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সামাজিক, অর্থনৈতিক এমনকী রাজনৈতিক কারণগুলি মুখ্য হলেও আরও কিছু কারণ বিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে। শিক্ষার প্রসার, যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থার উন্নতি সর্বোপরি বিশ্বায়নও উল্লেখিত কিছু কারণ। সেইসঙ্গে রাজবংশী সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব, শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা ও নিজের সংস্কৃতি বিষয়ে উদাসীনতা, অন্য সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ, হীনমন্যতাবোধ, অনুকরণ ইত্যাদি বিষয়গুলিও যুক্ত। বর্ণহিন্দুদের প্রভাব ও আধিপত্য বৃদ্ধি বিষয়টিও রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের একটি কারণ। সামগ্রিক প্রেক্ষিত বিচারে কীভাবে রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তন সংঘটিত হয়েছে তার বিস্তৃত আলোচনা এই অধ্যায়ে সংযুক্ত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও রাজবংশী জনগোষ্ঠী তাদের চিরায়ত সাংস্কৃতিক বলয়, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, রীতি আচারের প্রতি সংরক্ষণশীলতা, নৃগোষ্ঠীগত পরিচয় বজায় রাখার প্রয়াসের বিষয়টিও অধ্যায়ভুক্ত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে এই অধ্যায়ে গবেষণা প্রকল্পটির মূল বিষয় ‘‘উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তন’’-এর ক্ষেত্রটি দলিল দস্তাবেজ, তথ্যাদি, পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থাদি, ক্ষেত্র সমীক্ষার সাপেক্ষে সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।